বাংলাদেশ যুগে যুগে

বাংলাদেশ যুগে যুগে

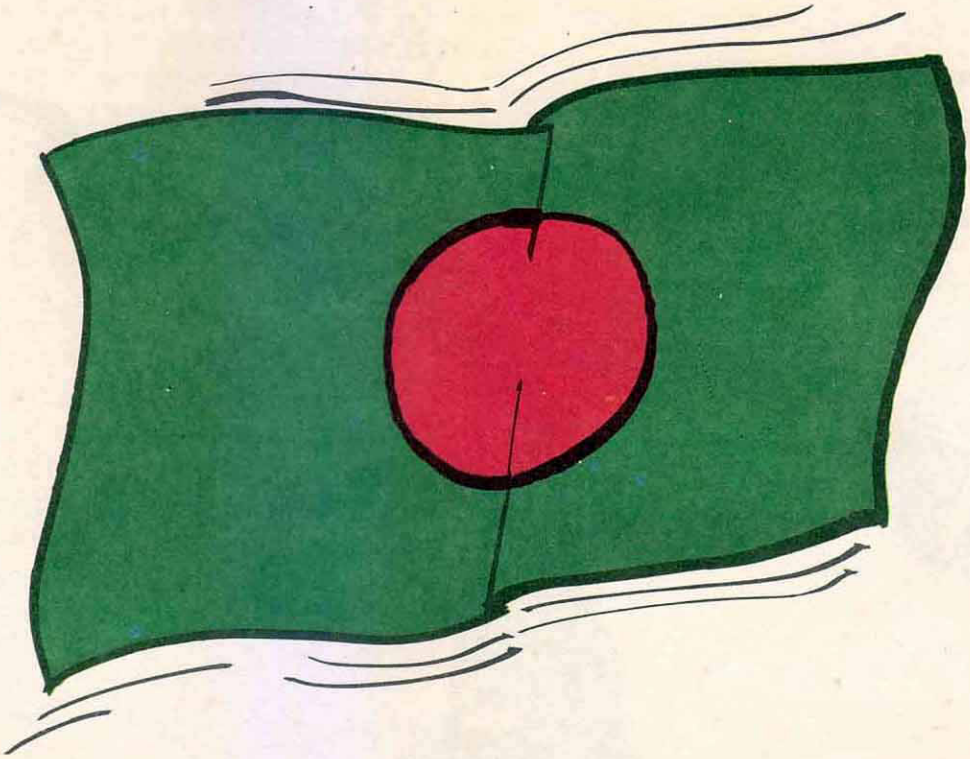

বাংলাদেশ শিশু একাডেমী

বাংলাদেশ যুগে যুগে

বাশিশুএ ৩৫৬
প্রকাশক : গোলাম কিবরিয়া
পরিচালক, বাংলাদেশ শিশু একাডেমী
পুরনো হাইকোর্ট এলাকা, ঢাকা-১০০০
প্রথম প্রকাশ : অগ্রহায়ণ ১৩৯৮, নভেম্বর ১৯৯১
দ্বিতীয় মুদ্রণ : জ্যৈষ্ঠ ১৪০৩, জুন ১৯৯৬
মুদ্রণে : বাংলাদেশ প্রগ্রেসিভ এন্টারপ্রাইজ প্রেস লিঃ
৪৬/১ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০
মূল্য : ৪০.০০

ইতিহাস প্রণয়ন ও শিল্পকর্মে যাঁরা সহযোগিতা করেছেন :
শিল্পী কামরুল হাসান, মিসেস জোবেদা খানম, শিল্পী শফিকুল আমীন, ড. কে. এম. মোহসীন, ড. এনামুল হক, ড. নাজিম উদ্দিন আহমদ, ড. এ. কে. এম. শামসুল আলম, ড. কে. এম. সিরাজুল ইসলাম, ড. মোবারক আলী আখন্দ, শিল্পী কাজী আবদুল বাসেত, জনাব মুস্তাফা মনোয়ার, শিল্পী মুহাম্মদ আবদুর রাজ্জাক, শিল্পী হাশেম খান, শিল্পী রফিকুন নবী, ড. মুনতাসীর মামুন এবং জনাব আবদুল মতিন সরকার।

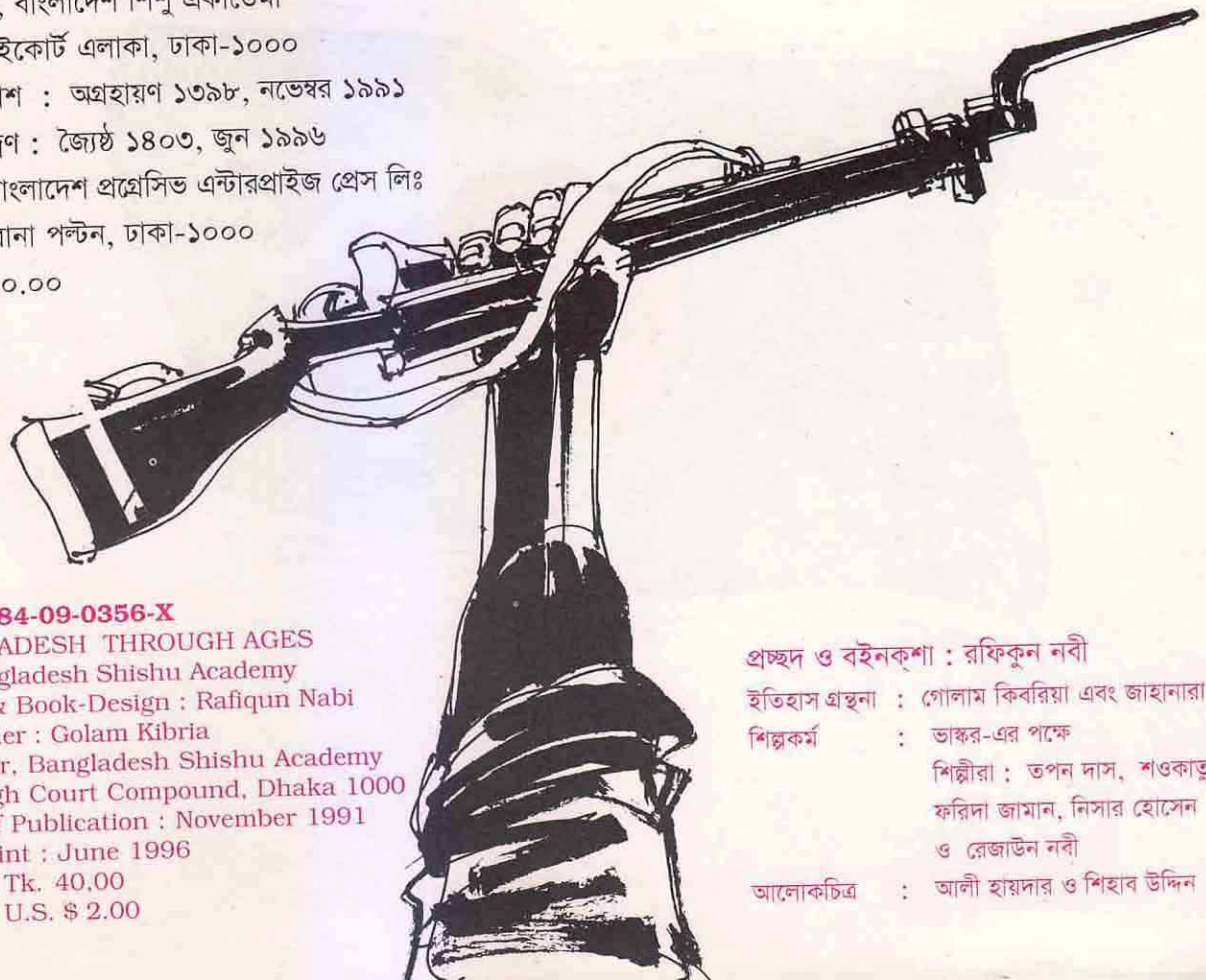

ISBN 984-09-0356-X
BANGLADESH THROUGH AGES
By Bangladesh Shishu Academy
Cover & Book-Design : Rafiqun Nabi
Publisher : Golam Kibria
Director, Bangladesh Shishu Academy
Old High Court Compound, Dhaka 1000
Date of Publication : November 1991
2nd Print : June 1996
Price : Tk. 40.00
U.S. $ 2.00

প্রচ্ছদ ও বইনক্‌শা : রফিকুন নবী
ইতিহাস গ্রন্থনা : গোলাম কিবরিয়া এবং জাহানারা রহমান
শিল্পকর্ম : ভাস্কর-এর পক্ষে
শিল্পীরা : তপন দাস, শওকাতুজ্জামান, ফরিদা জামান, নিসার হোসেন ও রেজাউন নবী
আলোকচিত্র : আলী হায়দার ও শিহাব উদ্দিন

প্রথম মুদ্রণের ভূমিকা

"বাংলাদেশ যুগে যুগে" বাংলাদেশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। বাংলাদেশ শিশু একাডেমীর জাদুঘরে ৭২টি শোকেস-এ ত্রিমাত্রিক শিল্পকর্মের মাধ্যমে প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে বাংলাদেশের অভ্যুদয়কাল পর্যন্ত বাংলার সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক ইতিহাস অতি সংক্ষেপে শিশুদের উপযোগী করে বর্ণনা করা হয়েছে। এত স্বল্প পরিসরে সমস্ত ঘটনা বিস্তারিতভাবে পরিবেশন করা সম্ভব নয়। যে বিষয়টির উপর আমরা গুরুত্ব দিয়েছি তা হচ্ছে—বাংলাদেশের মানুষের চরিত্রের প্রতিবাদী চেতনা তথা সকল প্রকার অন্যায়, অবিচার, অত্যাচার ও দুর্যোগের বিরুদ্ধে দুর্জয় ও সংগ্রামী শক্তির পরিচয় দেওয়া। প্রাকৃতিক দুর্যোগ এখানকার মানুষের নিত্যসঙ্গী। প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে তাদের নিয়ত সংগ্রাম করে বেঁচে থাকতে হয়। তাই সংগ্রাম তাদের অস্থিমজ্জায় মিশে আছে। তাদের উপর বহুবার বহিঃশত্রুর আক্রমণ ঘটেছে। দেশী ও বিদেশী শোষকেরা শোষণ ও লুণ্ঠন করেছে। কিন্তু বাঙালি তার নিজস্ব ভৌগোলিক পরিবেশে নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতিতে চিরকাল ঐক্যবদ্ধ থেকেছে এবং ঐক্যবদ্ধভাবে শত্রুর মোকাবিলা করেছে, অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছে। এই সংগ্রামী এবং প্রতিবাদী চেতনাই বাংলাদেশের মানুষের সবচেয়ে বড় সম্পদ, তার সবচেয়ে বড় গৌরবের বিষয়। এই সম্পদ সম্পর্কে, শিশু-কিশোরদের সচেতন করার লক্ষ্যেই শিশু জাদুঘর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং এই গ্রন্থ রচিত হয়েছে। যদি কোনো ভুলভ্রান্তি থাকে প্রয়োজনে তা সংশোধন করা হবে। আমরা আশা করি এই প্রচেষ্টা আমাদের নতুন প্রজন্মকে ঐতিহ্য সচেতন করে তুলতে সাহায্য করবে এবং একই সঙ্গে তাদের সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলতে উৎসাহিত এবং উদ্বুদ্ধ করবে।

নভেম্বর ১৯৯১

ড. কাজী আনোয়ারা মনসুর
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, ঢাকা

দ্বিতীয় মুদ্রণের ভূমিকা

'বাংলাদেশ যুগে যুগে'-এর প্রথম মুদ্রণ খুব অল্প সময়ে নিঃশেষিত হয়। পাঠকদের ব্যাপক চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হল। বাংলাদেশের ইতিহাস জানার জন্য পাঠকদের, বিশেষ করে শিশুদের এই আগ্রহ আমাদের আশান্বিত করেছে। দ্বিতীয় মুদ্রণে বিষয়বস্তুর কোনো পরিবর্তন করা হয় নি।

'বাংলাদেশ যুগে যুগে' বইটি পড়ে শিশু জাদুঘর সম্পর্কে সঠিক ধারণা হয়তো পাওয়া যাবে না তবে এ বই শিশু জাদুঘরটি দেখার জন্য শিশু-কিশোরদের আগ্রহ জাগিয়ে তুলবে। শিশু জাদুঘরটি নিজের চোখে দেখলে এর বৈশিষ্ট্য ও চমৎকারিত্ব পুরোপুরি উপলব্ধি করা যাবে। ত্রিমাত্রিক শিল্পকর্মের মাধ্যমে বাংলাদেশের হাজার বছরের সাংস্কৃতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ঘটনাবলী একবার অবলোকন করলে দর্শকেরা, বিশেষ করে শিশুরা খুব সহজে তাদের গৌরবময় ইতিহাস সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করতে পারবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

১৬.৬.৯৬

গোলাম কিবরিয়া
পরিচালক
বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, ঢাকা

Pdf Upload By:
MyMahbub.Com

জাতীয় সঙ্গীত

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি ॥
ওমা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে
মরি হায়, হায় রে–
ওমা, অঘ্রাণে তোর ভরা ক্ষেতে আমি কী দেখেছি মধুর হাসি ॥

কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্নেহ, কী মায়া গো––
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে।
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো
মরি হায় হায় রে––
মা, তোর বদনখানি মলিন হলে, ও মা, আমি নয়ন জলে ভাসি

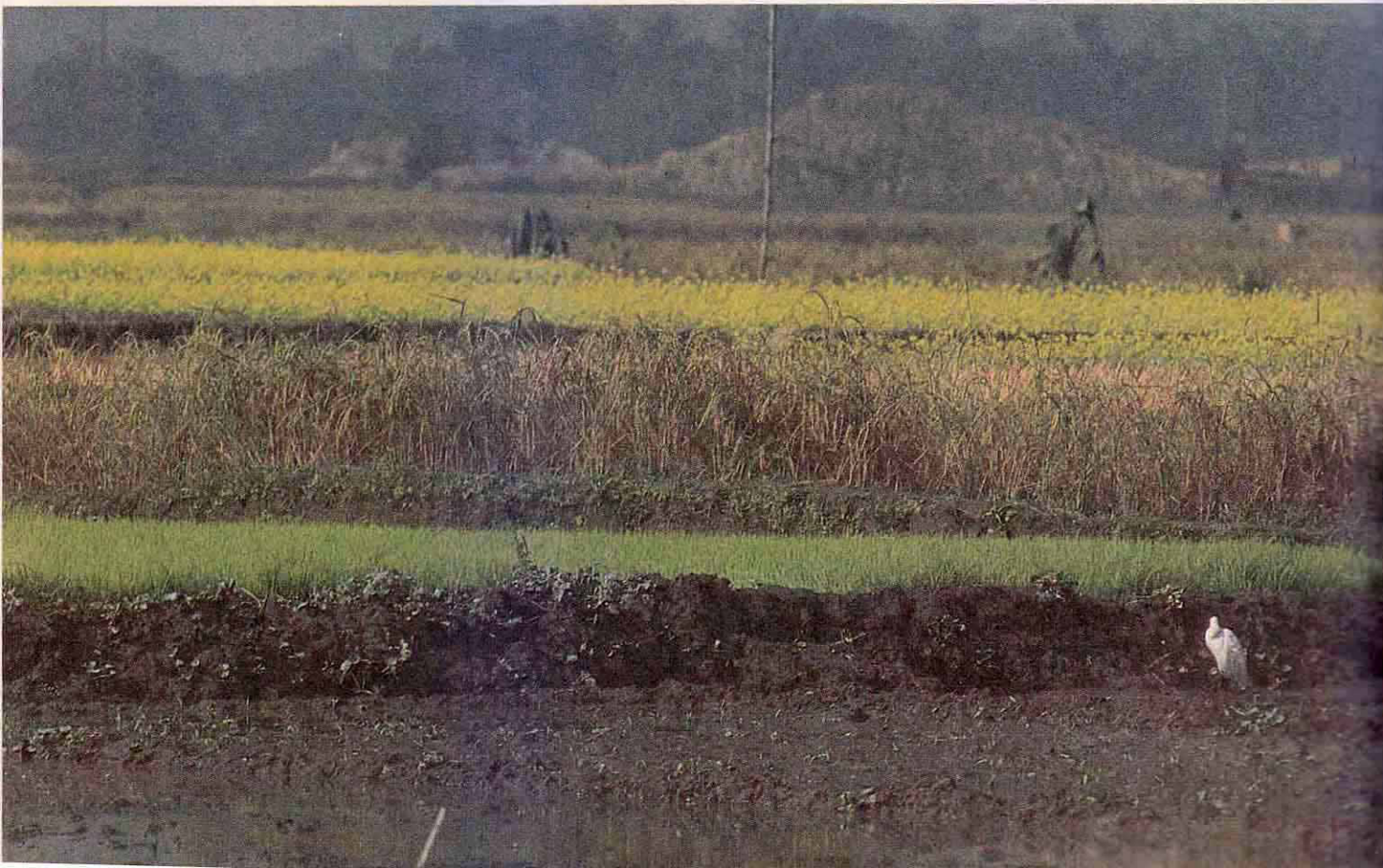

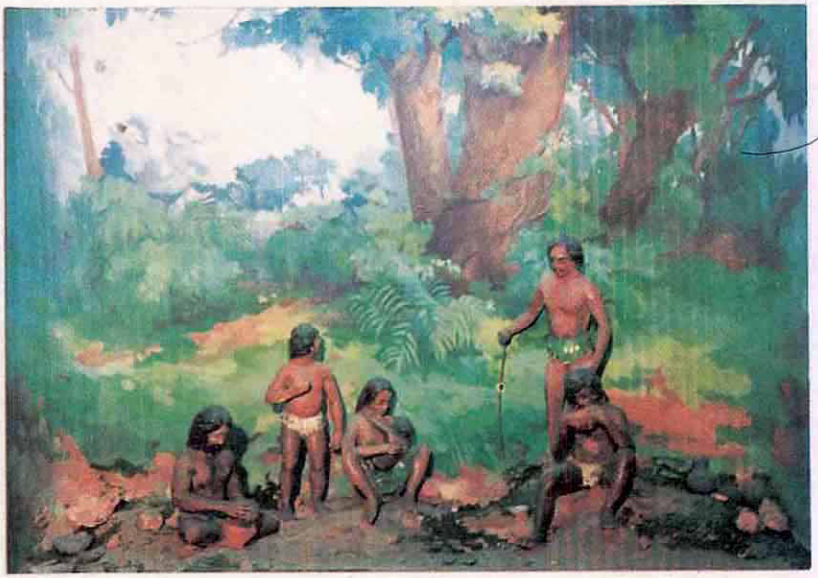

এক

প্রাগৈতিহাসিক যুগের বাংলাদেশ

অতি প্রাচীনকাল থেকেই বাংলাদেশে মানুষের বসতি ছিল। নোয়াখালীর ছাগলনাইয়া অঞ্চলে প্রাচীন যুগের মানুষের ব্যবহৃত পাথরের তৈরি কুঠারের নির্দশন পাওয়া গেছে।

দুই

মৌর্য যুগ (খ্রি. পূর্ব ৩২৪–১৮৭)

বাংলাদেশের উত্তর এবং ব-দ্বীপ অঞ্চলের কিছু অংশে মৌর্য সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। পুণ্ড্রনগর (বগুড়া জেলার মহাস্থানগড়) ছিল মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রাদেশিক রাজধানী। অষ্টম শতকে রাজা ধর্মপাল বর্তমান নওগাঁ জেলার পাহাড়পুরে বিখ্যাত সোমপুর বিহার (বৌদ্ধ বিদ্যাপীঠ ও ধর্মকেন্দ্র) প্রতিষ্ঠা করেন।

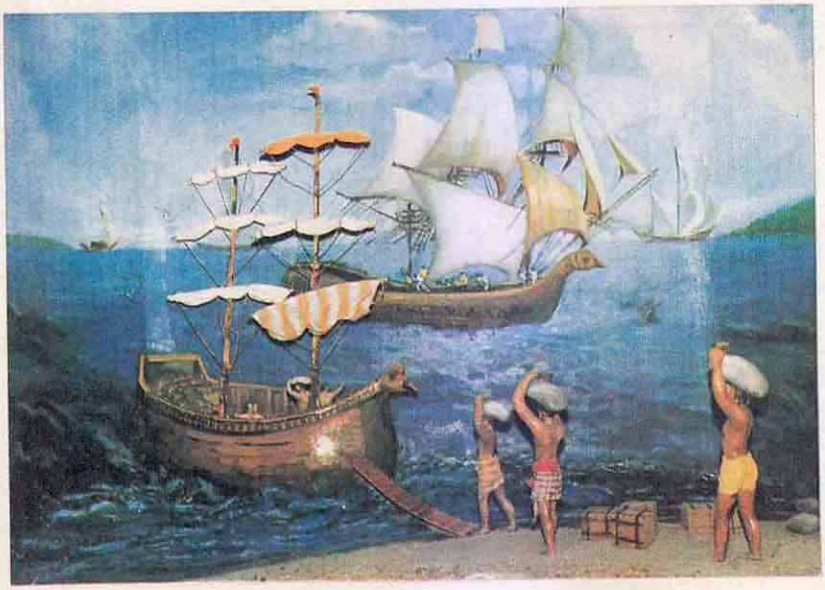

তিন

গুপ্ত যুগ (খ্রি. ৩২০–৪৬৮)

গুপ্তযুগের প্রতিষ্ঠাতা প্রথম চন্দ্রগুপ্ত। তাঁর সময়ে সংগীত, সাহিত্য, চিত্রকলা, বিজ্ঞান ও চিকিৎসাশাস্ত্রের ব্যাপক চর্চা হত। এই সময়ে বাংলাদেশের বাণিজ্যতরী ভারত মহাসাগর হয়ে বিভিন্ন দেশে যাতায়াত করত।

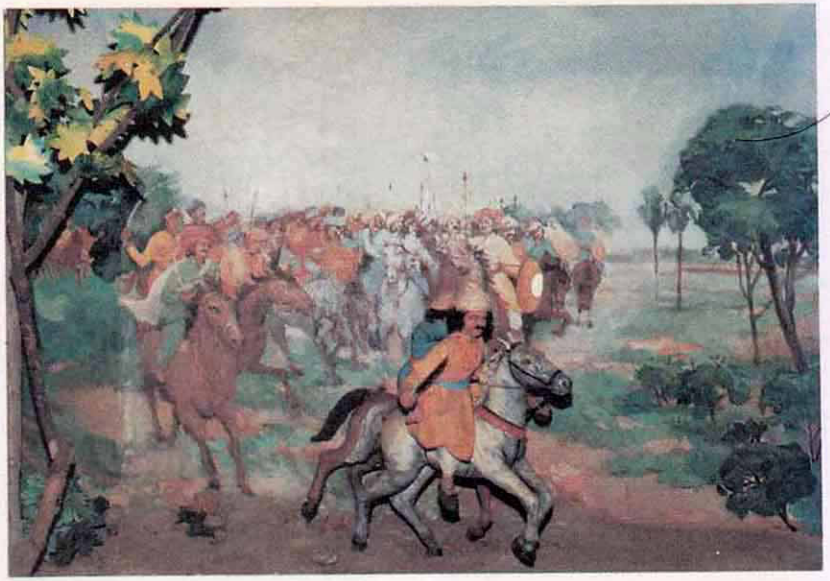

চার

শশাংক (৭ম শতক)

শশাংক ছিলেন অত্যন্ত শক্তিশালী রাজা। তিনিই প্রথম বাংলার বাইরে উত্তর-ভারতে আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন।

পাঁচ

পাল যুগ (খ্রি. ৭৫০–১১৬২)

শশাংকের মৃত্যুর পর দেশে অরাজকতা দেখা দিলে সামন্তবর্গ গোপালকে রাজা নির্বাচিত করে। তিনি বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী রাজা ছিলেন।

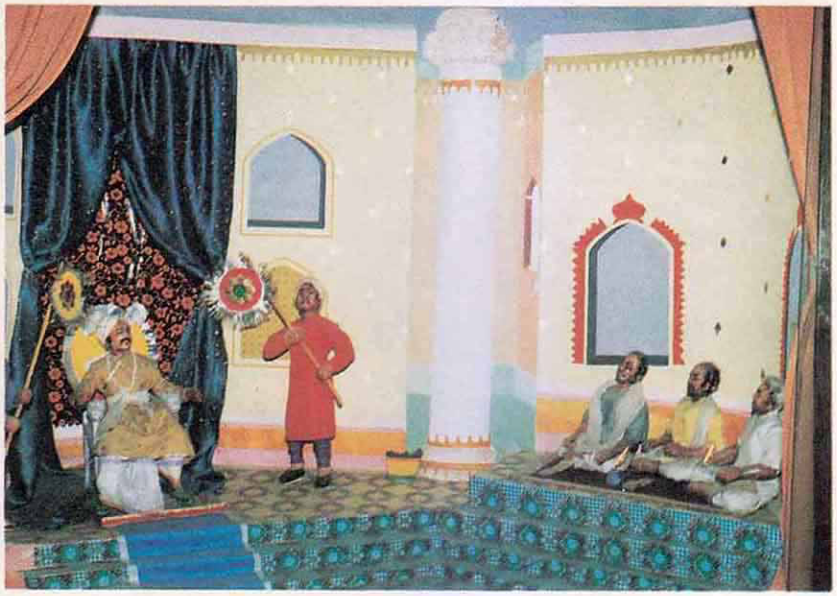

ছয়

সেন রাজবংশ (খ্রি. ১০৯৫–১২০৪)

রাজা সামন্ত সেন বাংলায় সেন রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। প্রায় সারা বাংলা সেন রাজবংশের অধীনে ছিল। এই বংশের শেষ রাজা লক্ষণ সেন পণ্ডিত ও জ্ঞানীগুণীদের কদর করতেন।

সাত

মুসলমানদের বাংলা বিজয় (খ্রি. ১২০৪)

ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বখতিয়ার খিলজী বাংলায় প্রথম মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ১২০৮ খ্রীঃ মাত্র ১৮ জন অগ্রগামী অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে রাজা লক্ষণ সেনকে পরাজিত করে বাংলায় মুসলিম রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

আট

তুর্কি শাসন (খ্রি. ১২২৭-৮১ এবং ১৩০১-২৮)

এই সময়ের মধ্যে মোট ১৫ জন তুর্কি সুলতান বাংলাদেশে রাজত্ব করেন। তাঁদের মধ্যে ১০ জন ছিলেন মামলুক বা ক্রীতদাস। এই সময়ের শ্রেষ্ঠ সুলতান শামসুদ্দীন ফিরুজ শাহ। হযরত শাহ্জালাল (রাঃ) তাঁর রাজত্বকালে সিলেটে আগমন করেন।

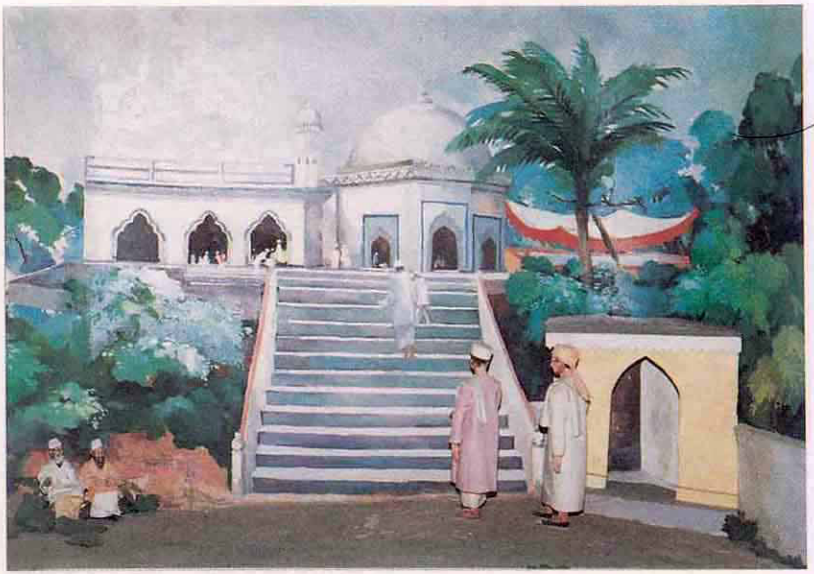

নয়

বলবন বংশ (খ্রি. ১২৮১–১৩০১)

দিল্লীর সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের পুত্র বুগরা খান ১২৯০ সাল পর্যন্ত বাংলায় শাসন করেন। তিনি বাংলাদেশকে এত ভালোবাসতেন যে পিতার মৃত্যুর পর দিল্লীর সুলতান না হয়ে পুত্র কায়কোবাদকে দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন। তাঁর সময়ে বাংলাদেশে ইসলাম ধর্মের ব্যাপক প্রচার ও প্রসার ঘটে।

দশ

ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ (খ্রি. ১৩৩৮–৪৯)

ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ বাংলার পূর্বাঞ্চলে রাজত্ব করেন। রাজধানী ছিল সোনার গাঁ। তাঁর সময়ে দেশে জিনিসপত্র খুব সস্তা ছিল। মরক্কোর বিখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতা এই সময়ে বাংলাদেশে এসেছিলেন।

এগার

ইলিয়াস শাহী বংশ (খ্রি. ১৩৪২–১৪১৪)

এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ। তাঁর পৌত্র সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ। তিনি কবি ছিলেন এবং পারস্যের বিখ্যাত কবি হাফিজকে বাংলাদেশ সফরে আমন্ত্রণ জানান। তিনি মক্কা ও মদিনায় অর্থ সাহায্য প্রেরণ করেন। তাঁর সময়ে চীনা পর্যটক মা হুয়ান বাংলার মসলিন, আসবাবপত্র ও হস্তশিল্পের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

বার

হোসেন শাহী যুগ (খ্রি. ১৪৯৩—১৫৩৮)

বাংলার সুলতানদের মধ্যে হোসেন শাহ ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁর পুত্র নুসরাত শাহও বেশ খ্যাতিমান ছিলেন। তাঁদের উৎসাহে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ব্যাপক উন্নতি হয়।

তের

আফগান শাসন (খ্রি. ১৫৩৮–৫৩)

আফগান বীর ফরিদ খান বা শের শাহ একজন সুশাসক ছিলেন। কথিত আছে, তিনি স্বহস্তে একটি বাঘ মেরে 'শের' উপাধি পেয়েছিলেন। তিনি অশ্ব-চালিত ডাকের প্রচলন এবং বাংলা থেকে পাঞ্জাব পর্যন্ত গ্র্যান্ড ট্রাংক রোড নির্মাণ করেন।

চৌদ্দ

বারো ভূঁইয়া (খ্রি. ১৫৭৬–১৬১২)

সম্রাট আকবরের আমলে বাংলার অনেকাংশে কয়েক জন ভূ-স্বামী স্বাধীনভাবে দেশ শাসন করতেন। তাঁরা বারো ভূঁইয়া নামে পরিচিত ছিলেন। এঁদের মধ্যে ঈশা খাঁ সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি মুঘল সেনাপতি মানসিংহকে যুদ্ধে পরাজিত করেছিলেন।

পনের

ইসলাম খান চিশতি (খ্রি. ১৬১০–১৩)

সুবাদার ইসলাম খান চিশতি বারো ভূঁইয়াদের পরাজিত করে বাংলায় মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ঢাকায় রাজধানী স্থাপন করে নাম রাখেন জাহাঙ্গীরনগর। তিনি একটি শক্তিশালী নৌবহরও গঠন করেছিলেন।

ষোল

সুবাদার শাহ সুজা (খ্রি. ১৬৩৯–৬০)

মুঘল সম্রাট শাহ্‌জাহানের পুত্র শাহ সুজা দীর্ঘ ২০ বছর বাংলার সুবাদার ছিলেন। তাঁর আমলে বাংলার কৃষ্টি ও ব্যবসা-বাণিজ্যে অনেক উন্নতি হয় এবং ইংরেজ বণিকরা বাংলায় ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ-সুবিধা লাভ করে।

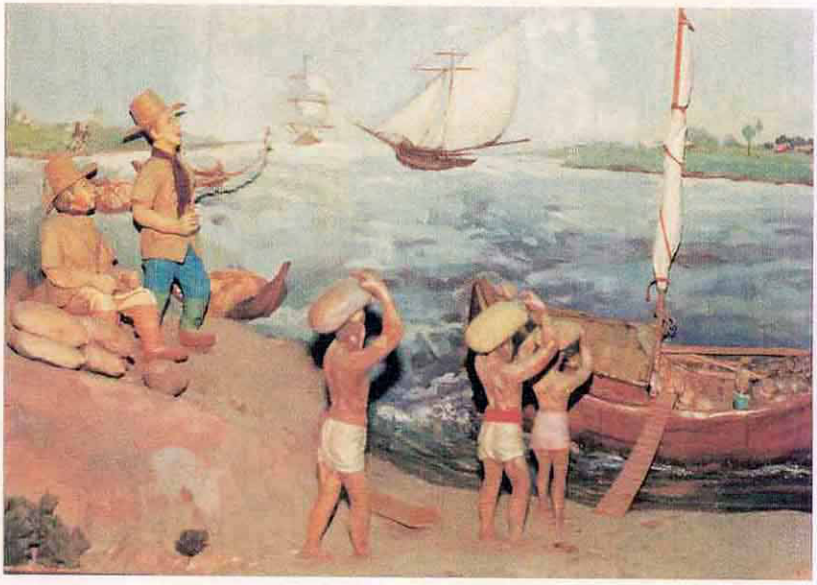

সতের

সুবাদার শায়েস্তা খান (খ্রি. ১৬৬৪–৮৮)

তাঁর আমলে বাংলায় শান্তি ও সমৃদ্ধি ছিল। তখন টাকায় আট মণ চাল পাওয়া যেত। তিনি অনেক সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা নির্মাণ করেন। ঢাকার লালবাগ দুর্গ তাঁরই কীর্তি।

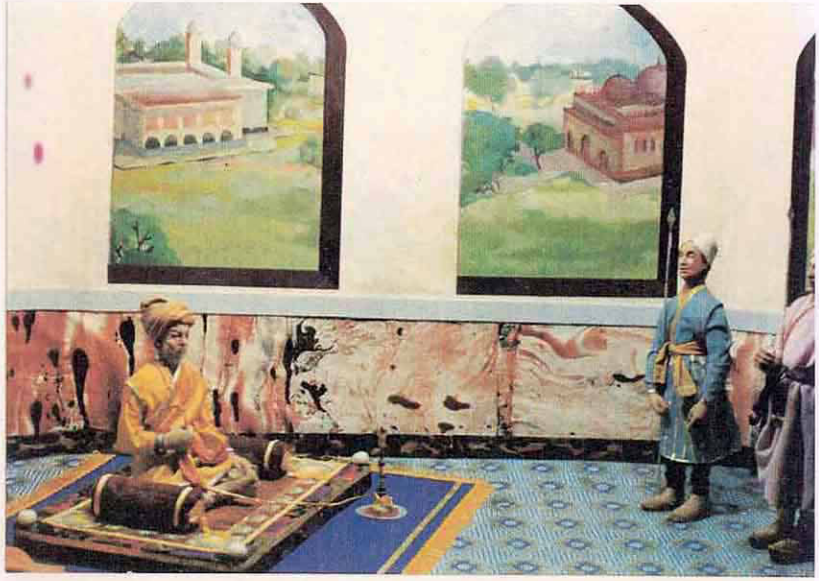

আঠার

মুর্শিদ কুলি খান (খ্রি. ১৭১৭–২৭)

তিনি ধার্মিক, বিজ্ঞ ও সুশাসক ছিলেন। তিনি ভূমি জরিপ করে খাজনা পুনঃ নির্ধারণ করেন। ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে রাজধানী স্থানান্তর করেন। তিনি ধর্মীয় অনুষ্ঠানও কোরআন পাঠের জন্য ২০০০ ক্বারী নিয়োগ করেন।

ঊনিশ

নবাব আলীবর্দী খান (খ্রি. ১৭৪০–৫৬)

তিনি বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাব ছিলেন। মারাঠা ও বর্গীদের আক্রমণ দৃঢ় হস্তে দমন করে তিনি বাংলায় শান্তি ফিরিয়ে আনেন।

কুড়ি

নবাব সিরাজউদ্দৌলা (খ্রি. ১৭৫৬–৫৭)

নবাব সিরাজউদ্দৌলা বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার শেষ স্বাধীন নবাব ছিলেন। সেনাপতি মীর জাফরের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে ২৩শে জুন **১৭৫৭ সালে** পলাশীর যুদ্ধে তিনি ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে পরাজিত হন।

একুশ

শক্তি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সিরাজ

পলাশীর যুদ্ধে পরাজিত হয়ে সিরাজউদ্দৌলা নতুন ভাবে শক্তি সংগ্রহের জন্য বিহারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন কিন্তু পথে মীর জাফরের গুপ্তচরের হাতে ধরা পড়েন।

বাইশ

নবাব সিরাজউদ্দৌলার মৃত্যু

(৩রা জুলাই, ১৭৫৭)

মীরজাফরের পুত্র মীরনের নির্দেশে মোহাম্মদী বেগ নামক এক ভৃত্য সিরাজউদ্দৌলাকে বন্দীশালায় নির্মমভাবে হত্যা করে।

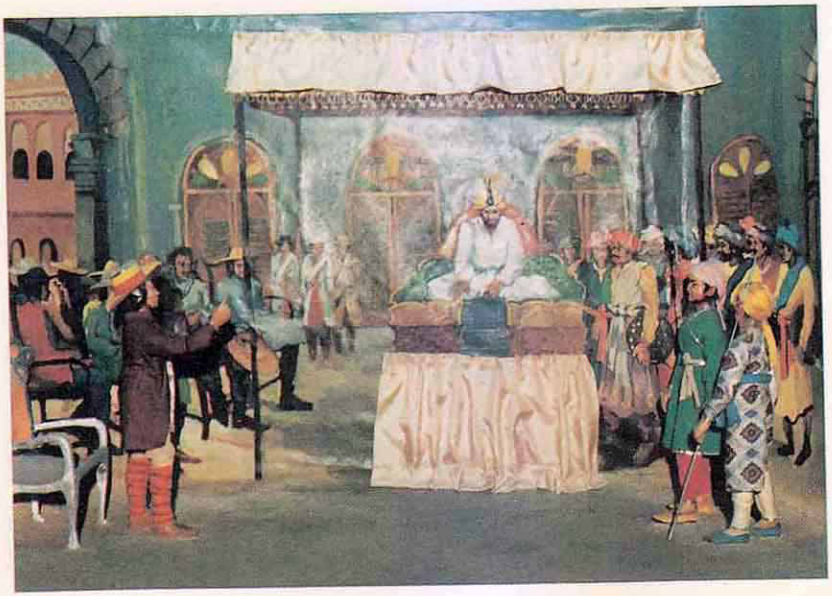

তেইশ

ষড়যন্ত্রকারীদের ক্ষমতা দখল

সিরাজের পর মীর জাফর নবাব হলেও প্রকৃত ক্ষমতা কোম্পানির হাতে চলে যায়। তারা পরে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করে মীর কাশিমকে সিংহাসনে বসায়।

চব্বিশ

কোম্পানির দেওয়ানী লাভ (খ্রি. ১৭৬৫)

মীর কাশিম ছিলেন স্বাধীনচেতা। ফলে ইংরেজদের সাথে তাঁর বিরোধ বাঁধে। বক্সারের যুদ্ধে ইংরেজরা তাঁকে পরাজিত করে ১৭৬৫ সালে মুঘল সম্রাটের নিকট থেকে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করে।

পঁচিশ

ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ (খ্রি. ১৭৬৩–১৮০০)

ইংরেজ আধিপত্যের বিরুদ্ধে বাংলার ফকির-সন্ন্যাসীরা বিদ্রোহ করে। এঁদের মধ্যে ফকির মজনু শাহ, করিম শাহ, বালাকী শাহ ও ভবানী পাঠকের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইংরেজদের সঙ্গে তাঁদের কয়েকটি যুদ্ধ হয়।

ছাব্বিশ

চাকমা বিদ্রোহ (খ্রি. ১৭৭৭–৮৭)

রাজস্ব বৃদ্ধির প্রতিবাদে পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমারা ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। বিদ্রোহীদের নেতৃত্ব দেন রুনু খান।

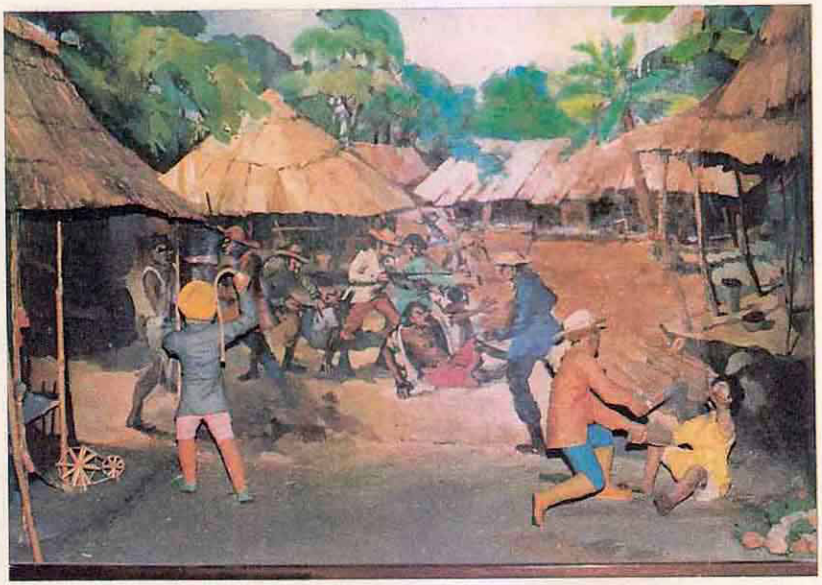

সাতাশ

বাংলার বিখ্যাত মসলিন

ঢাকার মসলিন কাপড়ের জন্য বাংলাদেশ পৃথিবীর বিখ্যাত ছিল। ইংরেজরা ইংল্যান্ডের কলকারখানায় তৈরি কাপড় বাজারজাত করার উদ্দেশ্যে বাংলার মসলিন-শিল্প ধ্বংস করে এবং তাঁতিদের উপর নানারূপ অত্যাচার করে।

আঠাশ

সৈয়দ নিসার আলী ওরফে তিতুমীর

(খ্রি. ১৭৭২–১৮৩১)

দেশপ্রেমিক তিতুমীর ইংরেজ এবং দেশীয় অত্যাচারী জমিদারদের বিরুদ্ধে একটি বাহিনী গড়ে তোলেন। তিনি চব্বিশ পরগনা জেলার নারিকেলবাড়িয়া গ্রামে একটি বাঁশের কেল্লা বানিয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। যুদ্ধে তিনি শহীদ হন।

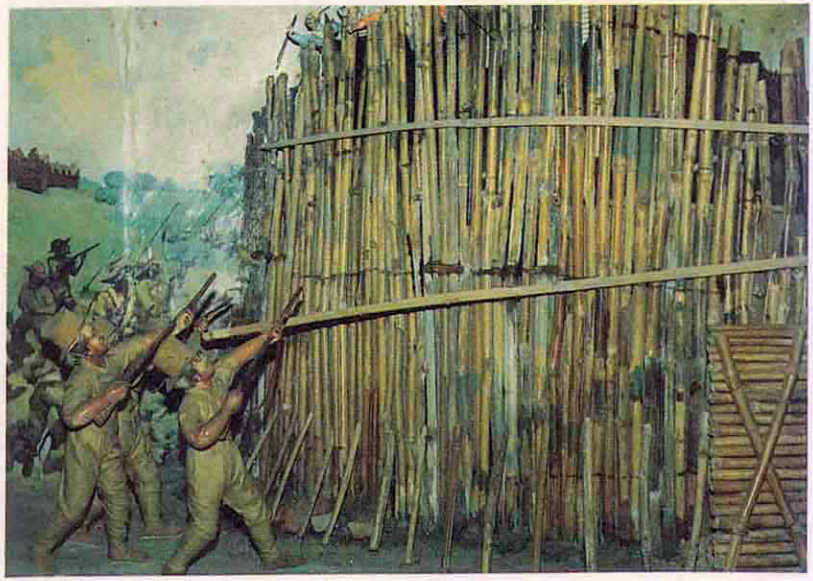

ঊনত্রিশ

হাজী শরিয়ত উল্লাহ (খ্রি. ১৭৮১–১৮৪০)

হাজী শরিয়ত উল্লাহ মুসলমানদের খাঁটি ইসলামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেন। তিনি ফরজ বা অবশ্যকরণীয় কাজগুলির উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করেন। তাই তাঁর আন্দোলন ইতিহাসে 'ফরায়েজী আন্দোলন' নামে পরিচিত।

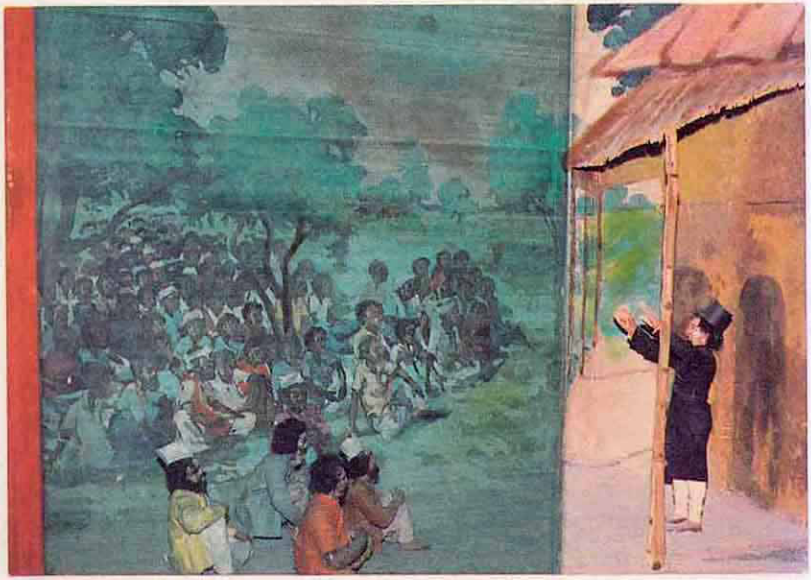

ত্রিশ

মুহম্মদ মহসীন উদ্দীন ওরফে দুদুমিয়া

(খ্রি. ১৮১৯–৬২)

হাজী শরিয়ত উল্লাহর পুত্র দুদুমিয়া অত্যাচারী ইংরেজ ও দেশীয় জমিদারদের বিরুদ্ধে জনগণকে সংগঠিত করেন। তিনি ঘোষণা করেন, পৃথিবীর মালিক আল্লাহ এবং জমির উপর সকলের সমান অধিকার।

একত্রিশ

প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম (খ্রি. ১৮৫৭–৫৮)

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কুশাসন ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে ভারতের সিপাহী-জনতা বিদ্রোহ করেন। তাঁরা শেষ মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে বাদশাহ্ ঘোষণা করেন। ঢাকার লালবাগ দুর্গের সিপাহীরা এই বিদ্রোহে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। ইংরেজরা এই বিদ্রোহকে শুধু সিপাহী বিদ্রোহ বলে আখ্যায়িত করে।

বত্রিশ

ইংরেজদের গণহত্যা

নেতৃত্বের ব্যর্থতা, যোগাযোগের অসুবিধা এবং একশ্রেণীর ইংরেজভক্তদের অসহযোগিতার ফলে এই মহাবিদ্রোহ ব্যর্থ হয়। ইংরেজরা নির্বিচারে গণহত্যা শুরু করে। ঢাকার বাহাদুর শাহ পার্কে বেশ কয়েকজন সিপাহীকে ফাঁসি দেওয়া হয়।

এই মহাবিদ্রোহের ফলে ভারতে কোম্পানি শাসনের অবসান ঘটে এবং ইংল্যান্ডের রানী ভিক্টোরিয়া ভারতের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন।

তেত্রিশ

নীল বিদ্রোহ (খ্রি. ১৭৭৮–১৮৬১)

ইংরেজ নীলকরগণ কৃষকদের ধান চাষের পরিবর্তে নীল চাষ করতে বাধ্য করত। নীল বিদেশে রফতানি করে ইংরেজরা প্রচুর অর্থ আয় করত। নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে কৃষকরা কয়েকবার বিদ্রোহ করে। ফলে ইংরেজগণ নীলচাষ বন্ধ করতে বাধ্য হয়।

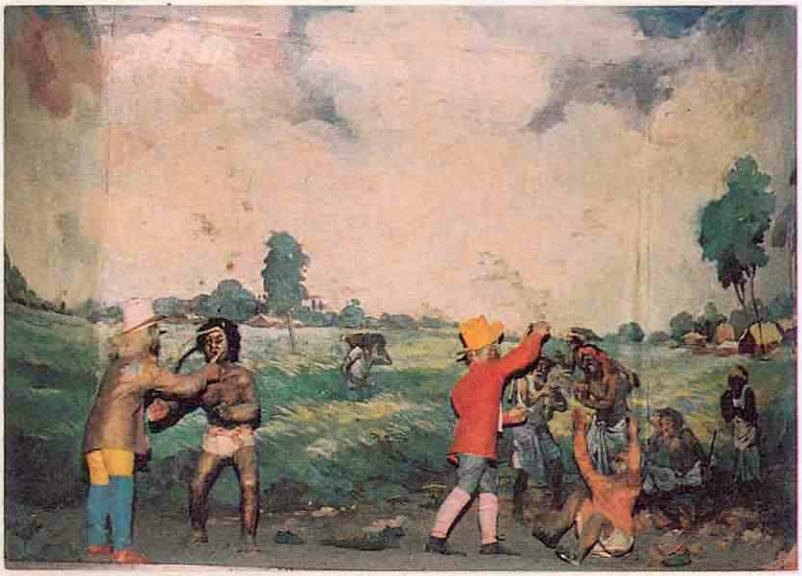

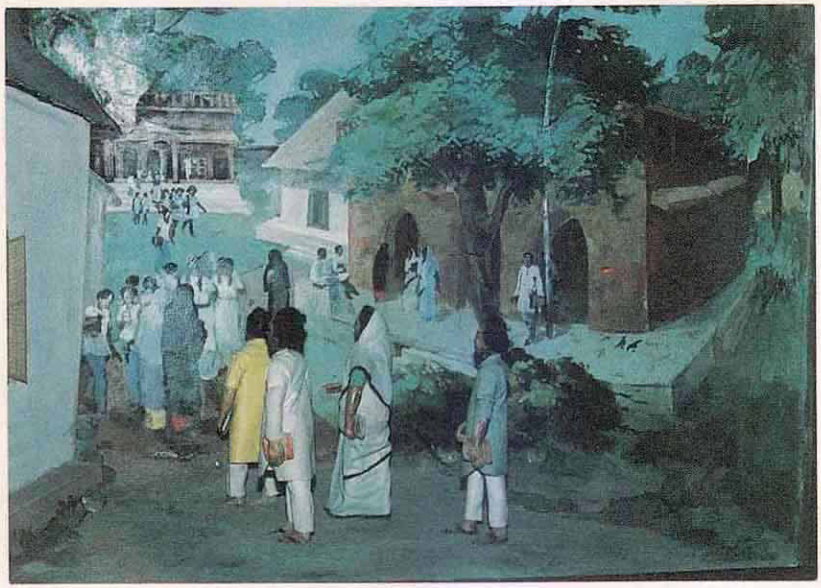

চৌত্রিশ

বঙ্গভঙ্গ (খ্রি. ১৯০৫)

ভারতের বড় লাট লর্ড কার্জন ১৯০৫ সালে বঙ্গ প্রদেশকে দুই ভাগে ভাগ করেন। ঢাকাকে পূর্ব বঙ্গ ও আসাম প্রদেশের রাজধানী করা হয়।

পঁয়ত্রিশ

মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা (খ্রি. ১৯০৬)

সারা ভারতের মুসলমানদের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার পুনঃ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নবাব সলিমুল্লাহর উদ্যোগে ঢাকায় 'নিখিল ভারত মুসলিম লীগ' নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠিত হয়। ইতিপূর্বে ১৮৮৫ সালে গঠিত হয়েছিল 'ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস'।

ছত্রিশ

বঙ্গভঙ্গ রদ (খ্রি. ১৯১১)

অগ্রসরমান হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রচণ্ড বিরোধিতার ফলে ইংরেজ সরকার ১৯১১ সালের ১লা জানুয়ারি বঙ্গভঙ্গ রদ করে।

সাঁইত্রিশ

মুসলমানদের ক্ষোভ

বঙ্গভঙ্গের ফলে পূর্ব বঙ্গের অবহেলিত সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানগণ শিক্ষা-দীক্ষা ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ লাভ করে। কিন্তু বঙ্গভঙ্গ রদ করায় তারা সেই সুযোগ থেকে আবার বঞ্চিত হয়। ফলে মুসলমানরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।

আটত্রিশ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (খ্রি. ১৮৬১–১৯৪১)

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সর্বপ্রথম বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে বিশ্বের দরবারে পরিচয় করিয়ে দেন। ১৯১৩ সালে তিনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান। বাংলা ভাষা, সাহিত্য, শিক্ষা, সংগীত ও চিত্রকলায় তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়। আমাদের জাতীয় সংগীত রবীন্দ্রনাথেরই রচনা।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের দীর্ঘ সময় কুষ্টিয়ার শিলাইদহে এবং পাবনার শাহজাদপুরে কাটিয়েছেন।

ঊনচল্লিশ

শেরে বাংলা আবুল কাশেম ফজলুল হক

(খ্রি. ১৮৭৬–১৯৬২)

শেরে বাংলা বাংলাদেশের অবহেলিত মুসলমানদের সার্বিক উন্নয়নের জন্য আজীবন সংগ্রাম করেছেন। ১৯৪০ সালের ২৩শে মার্চ তিনি লাহোর প্রস্তাবে ভারতের মুসলমানদের জন্য পৃথক পৃথক আবাসভূমির দাবি উত্থাপন করেন। প্রজাস্বত্ব আইন প্রবর্তন করে তিনি বাংলার কৃষকদের স্বার্থ সংরক্ষণ করেন। তিনি অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। পরে পূর্ব বাংলার গভর্ণর হন।

চল্লিশ

কাজী নজরুল ইসলাম (খ্রি. ১৮৯৯–১৯৭৬)

বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে এবং শোষিত মানুষের পক্ষে কবিতা লিখে 'বিদ্রোহী কবি' নামে খ্যাত হন। এই জন্য তাঁকে জেলে যেতে হয়। তাঁর উদ্দীপনাময় কবিতা ও গান আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রেরণা জুগিয়েছিল। শৈশবে কিছুকাল নজরুল ময়মনসিংহ জেলার দরিরামপুরে কাটিয়েছেন। এছাড়া কবির জীবনের শেষ দিনগুলো বাংলাদেশে কেটেছে।

একচল্লিশ

বাংলার বিপ্লবী আন্দোলন (খ্রি. ১৯০৩–৩০)

দেশ থেকে ইংরেজ বিতাড়নের জন্য স্বদেশী, খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের পাশাপাশি বাংলায় বিপ্লবাত্মক আন্দোলন সক্রিয় হয়ে ওঠে। সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে দেশ স্বাধীন করাই ছিল বিপ্লবীদের মুখ্য উদ্দেশ্য। ১৯৩০ সালে সূর্য সেন-এর নেতৃত্বে বিপ্লবীরা চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করেন। ১৮ বছরের তরুণ ক্ষুদিরাম বসু বাংলায় বিপ্লবী আন্দোলনের প্রথম শহীদ।

ক্ষুদিরাম বসু

সূর্য সেন

বেয়াল্লিশ

সর্বাত্মক স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রস্তুতি

ভারতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ প্রথমে মিলিতভাবে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু করে। কিন্তু কংগ্রেস মুসলিম লীগের দাবি অগ্রাহ্য করায় মুসলমানদের জন্য একটি আলাদা রাষ্ট্রের দাবীতে মুসলিম লীগ নতুন করে আন্দোলন শুরু করে।

তেতাল্লিশ

দুর্ভিক্ষের কবলে বাংলা (খ্রি. ১৯৪৩)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং অসাধু ব্যবসায়ীদের চক্রান্তের ফলে ১৯৪৩ সালে বাংলায় এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হয়। এতে প্রায় ৫০ লাখ লোক প্রাণ হারায়।

চুয়াল্লিশ

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী

(খ্রি. ১৮৯২–১৯৬৩)

তিনি প্রথমে অবিভক্ত বাংলার ও পরে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। দেশ বিভাগের সময় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা কবলিত এলাকায় তিনি শান্তি রক্ষার চেষ্টা করেন।

তিনি পাকিস্তানের সামরিক শাসনের বিরোধিতা করেন এবং গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার সংগ্রামে নেতৃত্ব দেন।

Zainul Abedin
1948

পঁয়তাল্লিশ

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন

(খ্রি. ১৯১৪–১৯৭৬)

তিনি বাংলাদেশের শিল্পকলা আন্দোলন ও লোক-শিল্প পুনর্জাগরণের পথিকৃত। মানুষের দুঃখ, বেদনা, বিদ্রোহ তাঁর ছবিতে মূর্ত হয়ে উঠেছে। ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের উপর তাঁর আঁকা ছবি আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করে।

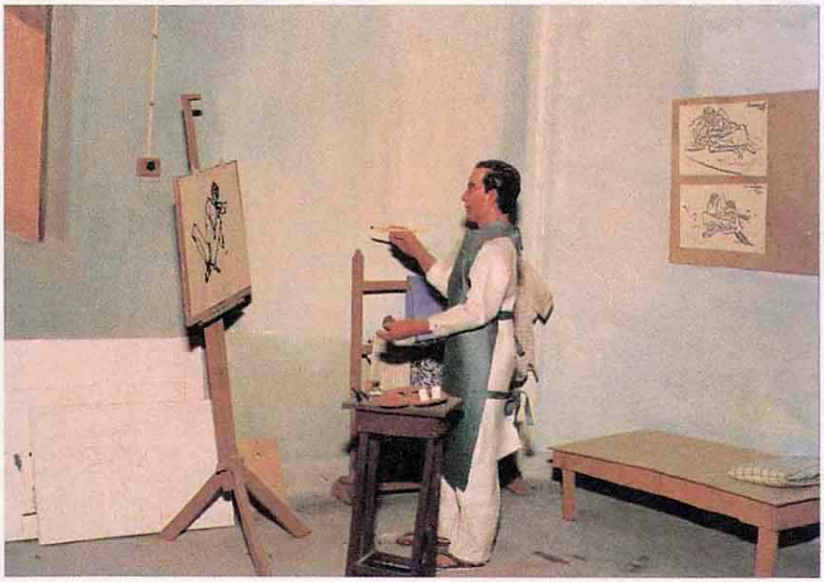

ছেচল্লিশ

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা (খ্রি. ১৯৪৭)

১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট ভারতের মুসলিম সংখ্যা-গরিষ্ঠ অঞ্চল—পূর্ব বঙ্গ, পশ্চিম পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ নিয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল ও লিয়াকত আলী খান প্রধানমন্ত্রী এবং খাজা নাজিমউদ্দিন পূর্ব বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হন।

সাতচল্লিশ

সমৃদ্ধ পশ্চিম পাকিস্তান

পশ্চিম পাকিস্তানের করাচীতে কেন্দ্রীয় রাজধানী স্থাপন করে দেশের সকল অফিসের সদর দফতর স্থানান্তর করা হয়। ফলে অতি অল্প সময়ে সেখানে শিল্প-বাণিজ্য, বড় বড় কলকারখানা ও ইমারত গড়ে উঠতে থাকে।

আটচল্লিশ

বঞ্চিত পূর্ব পাকিস্তান

পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার পর হতেই পূর্ব পাকিস্তান থেকে সম্পদ পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হতে থাকে। সংখ্যা গরিষ্ঠতা সত্ত্বেও সরকারি চাকুরি, সামরিক বাহিনীতে যোগদান, ব্যবসা-বাণিজ্য সব দিক দিয়েই পূর্ব পাকিস্তানের চেয়ে পশ্চিম পাকিস্তানকে অগ্রাধিকার দেওয়া হল।

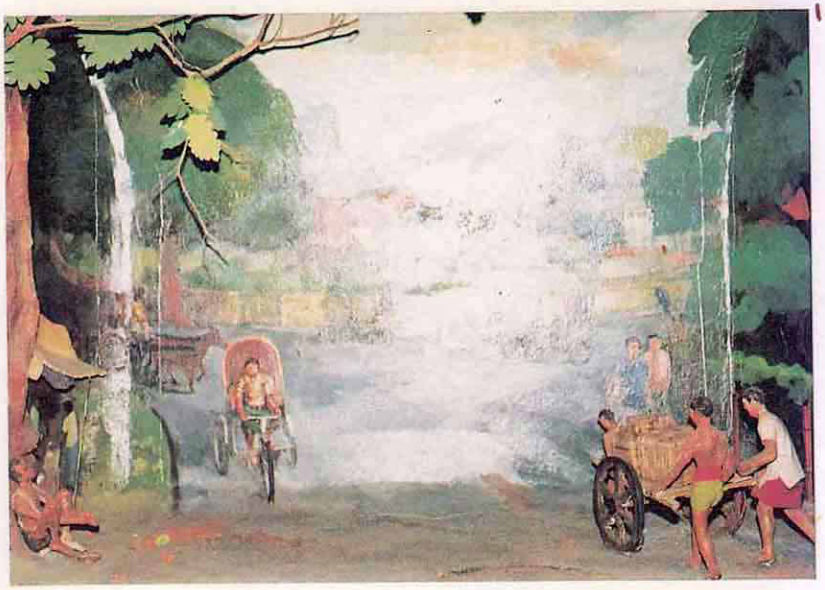

উনপঞ্চাশ

বৈষম্যের রাজনীতি

লাহোর প্রস্তাবের মূলকথা ছিল আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসন ও আত্মনিয়ন্ত্রণের পূর্ণ অধিকার। কিন্তু ক্ষমতা কুক্ষিগত করার জন্য কেন্দ্রীয় শাসকগোষ্ঠী সে কথা ভুলে যায়। তাদের স্বার্থপরতা ও অদূরদর্শিতার ফলে পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের মধ্যে বৈষম্য ও এবং অবিশ্বাস বেড়ে যেতে থাকে।

পঞ্চাশ

সোনালি আঁশ

পূর্ব পাকিস্তানকে শোষণের প্রত্যক্ষ উদাহরণ পাট। এখানকার প্রধান অর্থকরি ফসল হিসাবে পাটকে সোনালি আঁশ বলা হয়। পাট ছিল সমগ্র পাকিস্তানের প্রধান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী ফসল। অথচ অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার বেশির ভাগই ব্যয় হত পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়নের জন্য।

একান্ন

প্রথম বিস্ফোরণ (২১শে মার্চ, ১৯৪৮)

ঢাকার রেসকোর্স মাঠে (সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) মুহম্মদ আলী জিন্নাহ উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা করার সাথে সাথে বাঙালিরা তীব্র প্রতিবাদ করে। সেটাই ছিল কেন্দ্রীয় শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলায় ক্ষোভের প্রথম বহিঃপ্রকাশ।

বাহান্ন

ভাষা আন্দোলন (২১শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২)

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নাজিম উদ্দিন কর্তৃক পুনরায় উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা করার প্রতিবাদে ঢাকার ছাত্র-জনতা ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা অমান্য করে শোভাযাত্রা বের করে। পুলিশ মিছিলের উপর গুলিবর্ষণ করলে বরকত, সালাম, রফিক, জব্বার, সালাহউদ্দিনসহ অনেকে শহীদ হন।

শহীদ বরকত

শহীদ রফিক উদ্দিন

শহীদ শফিউর রহমান

তিপ্পান্ন

শহীদ মিনার : প্রতিবাদী চেতনার প্রতীক

একুশে ফেব্রুয়ারিতে যে স্থানটি রক্তরঞ্জিত হয়েছিল ২৩শে ফেব্রুয়ারি ছাত্র-জনতা সে স্থানে একটি শহীদ মিনার নির্মাণ করেন। কিন্তু পুলিশ তা ভেঙে দেয়। এরপরও শহীদ মিনারের অনেক ভাঙাগড়া হয়। অবশেষে দেশ স্বাধীন হবার পর নির্মিত হয় স্থায়ী শহীদ মিনার।

শহীদ মিনার এখন আর শুধু ভাষা আন্দোলনের প্রতীক নয়। শহীদ মিনার যে-কোনো অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী চেতনার প্রতীক।

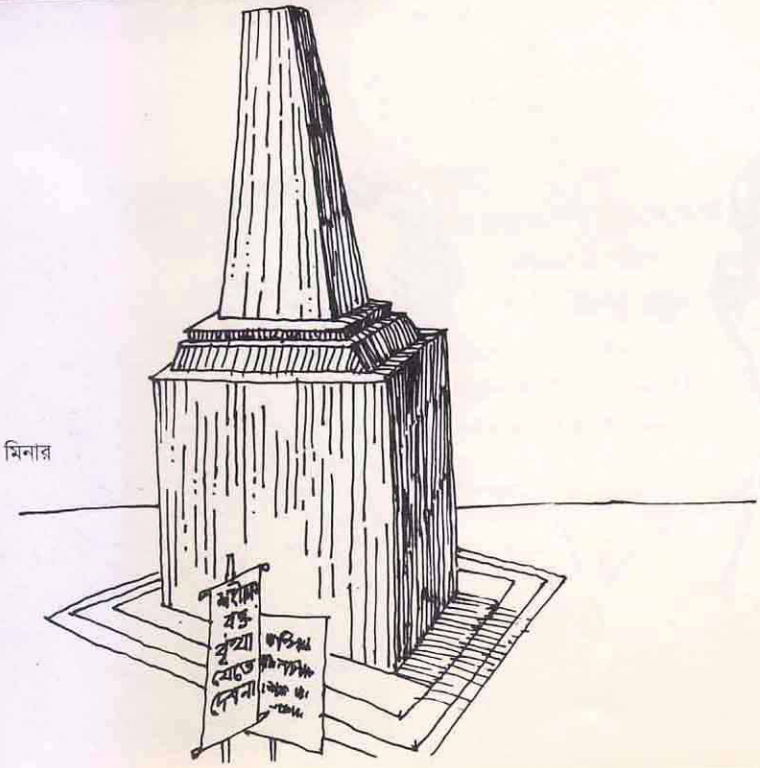

প্রথম শহীদ মিনার

চুয়ান্ন

যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা গঠন ও বাতিল (খ্রি. ১৯৫৪)

১৯৫৪ সালে পূর্ব বাংলায় প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। শেরে বাংলা, মাওলানা ভাসানী ও শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে গঠিত যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে জয়লাভ করে মন্ত্রীসভা গঠন করে। কেন্দ্রীয় শাসক গোষ্ঠী ৯২-ক ধারা জারি করে পূর্ব বাংলায় প্রেসিডেন্টের শাসন প্রবর্তন করে এবং যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা বাতিল করে দেয়।

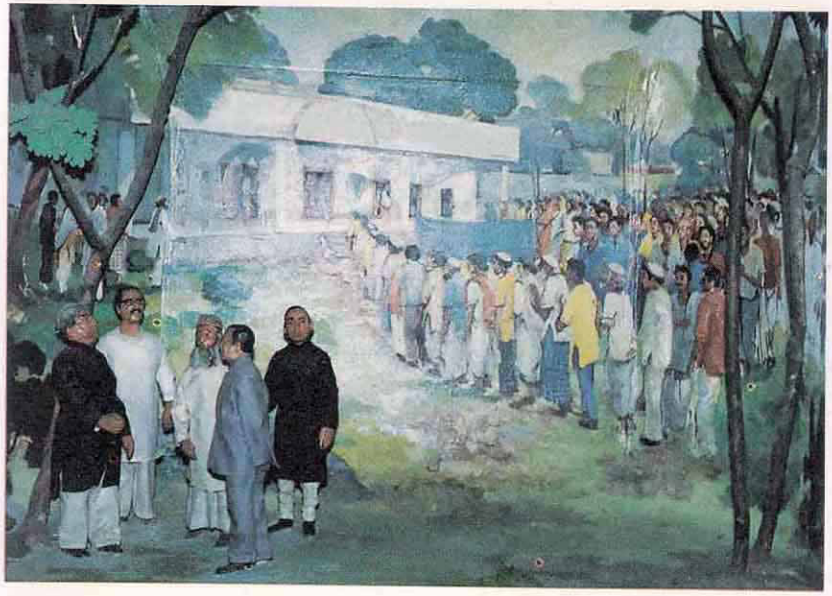

পঞ্চান্ন

প্রথম সংবিধান প্রণয়ন ও সাধারণ নির্বাচনের প্রস্তুতি (খ্রি. ১৯৫৬)

এ পর্যন্ত সমগ্র পাকিস্তান ৫টি প্রদেশে বিভক্ত ছিল। পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান প্রণীত হবার পর পাকিস্তানকে দুই ইউনিটে ভাগ করা হয়। এক অংশের নাম পূর্ব পাকিস্তান ও অপর অংশের নাম পশ্চিম পাকিস্তান। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে কেন্দ্রে আওয়ামী লীগ মন্ত্রীসভা গঠিত হয় এবং দেশব্যাপী সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেওয়া হয়।

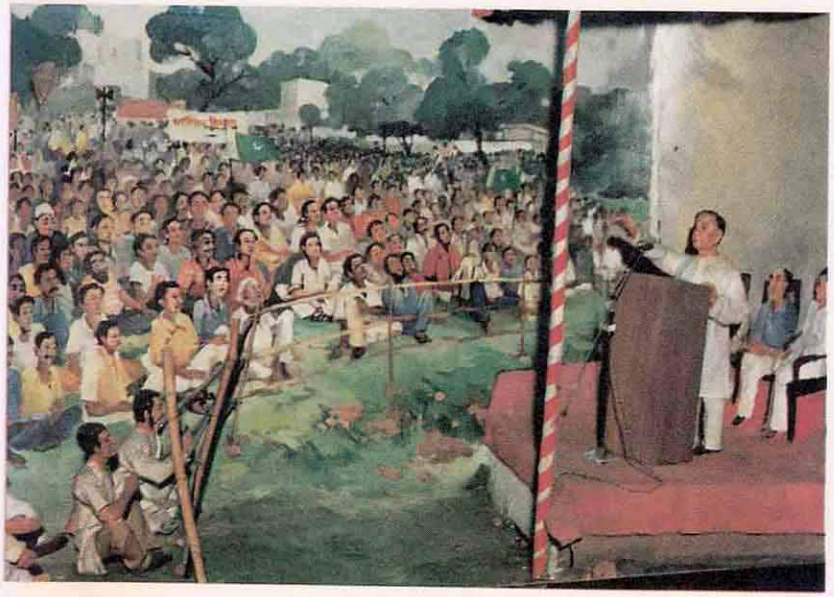

ছাপ্পান্ন

সামরিক বাহিনীর ক্ষমতা দখল

(৭ই অক্টোবর, ১৯৫৮)

সাধারণ নির্বাচনের পূর্ব মুহূর্তে সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল আইয়ুব খানের নেতৃত্বে সেনাবাহিনী রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে। বাক-স্বাধীনতাসহ জনগণের সকল মৌলিক অধিকার হরণ করা হয়। বরণ্যে রাজনৈতিক নেতাদের কারারুদ্ধ করা হয়। আইয়ুব শাসনের ১০ বছর দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও কালাকানুনের জন্য 'কালো দশক' হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছে।

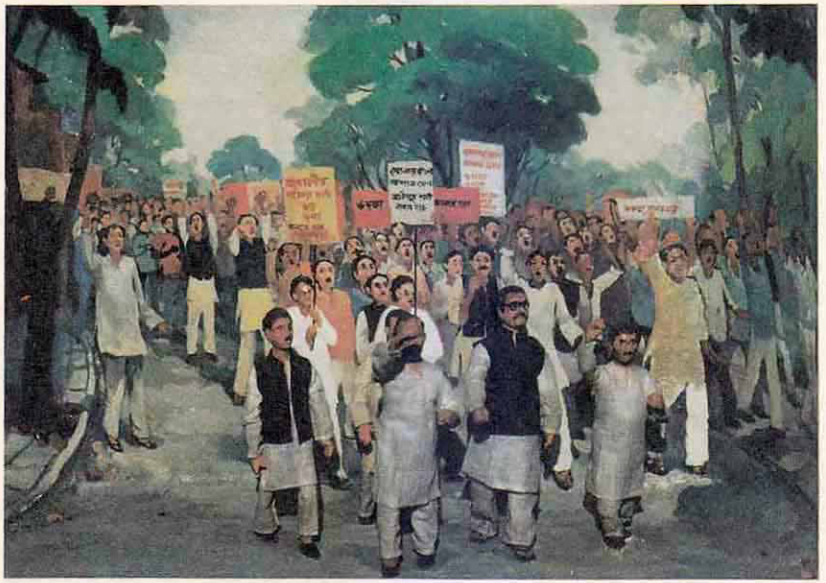

সাতান্ন

স্বাধিকার সংগ্রামের সূচনা (খ্রি. ১৯৬৬)

আইয়ুবের আমলে দেশের দুই অঞ্চলের অর্থনৈতিক বৈষম্য চরমে ওঠে। পূর্ব পাকিস্তানকে শোষণের হাত থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান ৬ দফা দাবি ঘোষণা করেন। বাংলার মানুষ ৬ দফার প্রতি সমর্থন জানায়। সরকার শেখ মুজিবসহ অনেককে গ্রেফতার করে। তাঁদের বিরুদ্ধে তথাকাথিত আগরতলা মামলা দায়ের করা হয়।

আটান্ন

ব্যাপক গণ-অভ্যুত্থান (খ্রি. ১৯৬৮–৬৯)

স্বাধিকার ও আগরতলা মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে মজলুম জননেতা মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে দুর্বার গণ-আন্দোলন পরিচালিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রাম পরিষদ জনগণের সার্বিক মুক্তির লক্ষ্যে ১১ দফা দাবি পেশ করে। গণবিক্ষোভের মুখে আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করা হয় এবং সকল রাজবন্দীকে মুক্তি দেয়া হয়। ১৯৬৯ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারি রেসকোর্সের মাঠে জনতা শেখ মুজিবকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করে।

২৪শে মার্চ সেনাপতি জেনারেল ইয়াহিয়া খানের নেতৃত্বে সামরিক বাহিনী পুনরায় রাষ্ট্র-ক্ষমতা দখল করে এবং দেশে সামরিক শাসন জারি করে।

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী

শহীদ মতিউর

ঊনষাট

বৃহত্তম প্রাকৃতিক দুর্যোগ (খ্রি. ১৯৭০)

১২ই নভেম্বর পূর্ব পাকিস্তানের সমুদ্র তীরবর্তী জেলাগুলোতে এক ভয়াবহ সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের ফলে প্রায় ১০ লাখ লোক প্রাণ হারায় এবং বিপুল সম্পত্তির ক্ষতি সাধিত হয়। বাংলার মানুষের এই দুর্দিনে বিশ্ববাসী শোকে মুহ্যমান হলেও পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী চরম ঔদাসীন্যের পরিচয় দেয়।

ষাট

প্রথম সাধারণ নির্বাচন

(৭ই ডিসেম্বর ১৯৭০ খ্রি.)

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ ২৩ বছর পর ৭ই ডিসেম্বর সারা দেশে প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এতে আওয়ামী লীগ বিপুল ভোটে জয়লাভ করে। পিপলস্ পার্টির নেতা জেড. এ. ভুট্টো অন্যায়ভাবে শাসনক্ষমতা দাবি করলে বাংলার মানুষ তা প্রত্যাখান করে। ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করেন।

একষট্টি

স্বাধীন বাংলার প্রথম পতাকা উত্তোলন

(খ্রি. ১৯৭১)

২রা মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ডাকসুর নেতৃত্বে আনুষ্ঠানিকভাবে সবুজের উপর লালবৃত্তের মাঝখানে হলুদ বর্ণের বাংলাদেশের মানচিত্র অংকিত স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম পতাকা উত্তোলন করা হয়।
৩রা মার্চ থেকে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে দেশব্যাপী অনির্দিষ্ট কালের জন্য অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়।

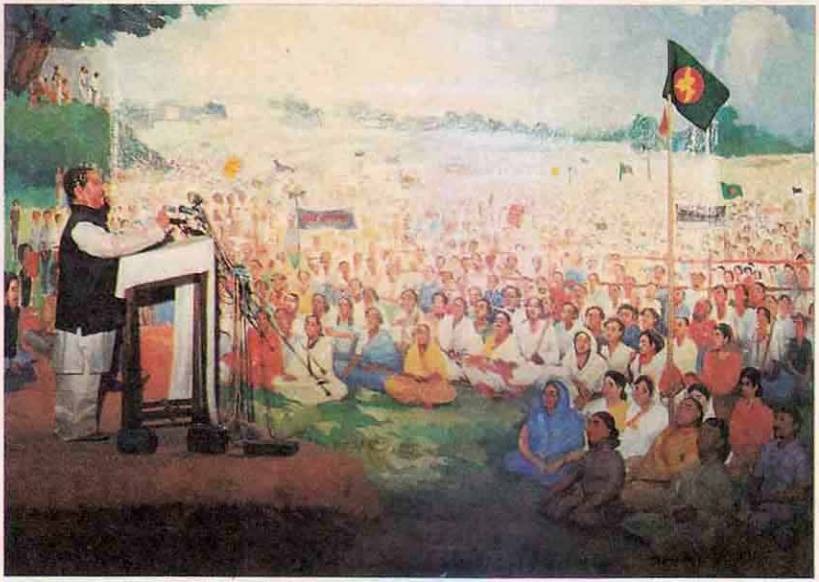

বাষট্টি

বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ (৭ই মার্চ, ১৯৭১)

৭ই মার্চ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের এক বিশাল জনসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জনগণকে স্বাধীনতার জন্য সর্বাত্মক প্রস্তুতি গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে বলেন, "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম"।

তেষট্টি

ব্যাপক গণহত্যা শুরু (২৫শে মার্চ, ১৯৭১)

১৫ই মার্চ থেকে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ভুট্টো ও বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে এক প্রহসনমূলক আলোচনা শুরু করে। একই সময়ে সামরিক বাহিনী গোপনে দেশবাসীর উপর সর্বাত্মক আক্রমণের প্রস্তুতি নিতে থাকে। ২৫শে মার্চ মধ্যরাত থেকে সেনাবাহিনী বাঙালিদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।
এই রাতে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হয়।

চৌষট্টি

স্বাধীনতা ঘোষণা (২৬শে মার্চ, ১৯৭১)

গ্রেফতার হবার পূর্বক্ষণে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা যুদ্ধের আহবান জানিয়ে বাণী প্রেরণ করেন। ২৬শে মার্চ সর্বস্তরের জনগণ সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগ্রাম শুরু করে। মেজর জিয়াউর রহমান (পরবর্তীকালে রাষ্ট্রপতি) চট্টগ্রামের কালুর ঘাট স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র থেকে ২৭শে মার্চ বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।

এই ঘোষণা আমাদের মুক্তি সংগ্রামে তীব্র গতি সঞ্চার করে।

জেনারেল মো. আতাউল গনি ওসমানী

পঁয়ষট্টি

স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠন

(১৭ই এপ্রিল, ১৯৭১)

মুজিবনগরে (কুষ্টিয়ার মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলা ইউনিয়নের ভবের পাড়া গ্রাম) আনুষ্ঠানিকভাবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ-এর অস্থায়ী সরকার গঠিত হয় এবং মন্ত্রীসভা শপথ গ্রহণ করে।

বঙ্গবন্ধুকে রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচিত করা হয়। তাঁর অবর্তমানে সৈয়দ নজরুল ইসলাম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি এবং তাজউদ্দিন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী করা হয়। কর্ণেল মো. আতাউল গনি ওসমানীকে (পরবর্তীকালে জেনারেল) সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করা হয়।

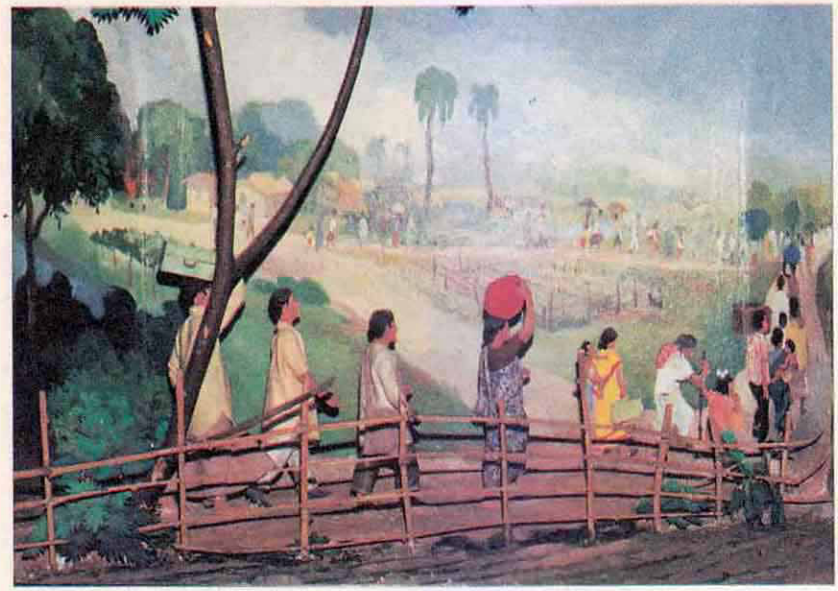

সৈয়দ নজরুল ইসলাম

ছেষট্টি

এক কোটি লোকের দেশত্যাগ

পাকবাহিনী ও তার দেশীয় সহযোগীদের অত্যাচারে প্রায় ১ কোটি লোক মাতৃভূমি ত্যাগ করে প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করে।

সাতষট্টি

মুক্তিবাহিনী গঠন

দেশকে শত্রুমুক্ত করার উদ্দেশ্যে বাঙালি পুলিশ, সৈনিক, আনসার, ই.পি.আর., (বর্তমানে বিডিআর) ছাত্র, কৃষক তথা সর্বস্তরের জনগণকে নিয়ে মুক্তিবাহিনী গঠন করা হয়। কর্নেল ওসমানীকে মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত করা হয়। দেশের ভিতরে ও বাইরে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ শুরু হয়। তাদের প্রধান শ্লোগান ছিল, 'জয় বাংলা'।

তাজউদ্দিন আহমদ

আটষট্টি

স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ

স্বাধীনতা লাভের জন্য মুক্তিবাহিনী পাক-হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে দীর্ঘ নয় মাস বীর-বিক্রমে যুদ্ধ করে। এতে শিশু-কিশোর ও এবং মেয়েরাও অংশ গ্রহণ করে। ৩০ লাখ বাঙালি শহীদ হয়। পশ্চিম পাকিস্তানে আটক বাঙালিরাও এই সময় চরম উদ্বেগের মধ্যে দিন কাটায়।

উনসত্তর

শহীদ বুদ্ধিজীবী হত্যা

স্বাধীনতার প্রাক্‌কালে পাক-বাহিনী, দেশীয় রাজাকার, আলবদর, আলশামস্ প্রভৃতি স্বাধীনতার শত্রুরা সুপরিকল্পিতভাবে দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, শিল্পী, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, আইনজীবী প্রমুখ বুদ্ধিজীবীদের ব্যাপক হারে হত্যা করে। ১৪ই ডিসেম্বর সবচেয়ে বেশি হত্যাকাণ্ড হয়। এই জন্য ১৪ই ডিসেম্বরকে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস বলা হয়।

সত্তর

স্বাধীনতার সংগ্রামের চূড়ান্ত বিজয়
(১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১)

মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় বাহিনীর যৌথ আক্রমণের ফলে পাকিস্তানী হানাদাররা সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত ও পরাজিত হয়। ১৬ই ডিসেম্বর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে (বর্তমানে যেখানে শিশু পার্ক) প্রায় ১ লাখ সৈন্য নিয়ে পাক বাহিনী আত্মসমর্পণ করে।

সূচিত হয় বাংলাদেশের চূড়ান্ত বিজয়। এই যুদ্ধে বাংলাদেশের ত্রিশ লাখ লোক শহীদ হয়।

একাত্তর

স্বাধীন বাংলাদেশ

দেশ শত্রুমুক্ত হওয়ার সাথে সাথে বাংলাদেশের ঘরে ঘরে উড়তে থাকে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা। বিজয়ী বেশে মুক্তিযোদ্ধারা দেশে ফিরে আসে। দেশবাসী কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁদের আন্তরিক অভিনন্দন জানায়। পৃথিবীর মানচিত্রে যুক্ত হল একটি নতুন দেশ—বাংলাদেশ।

বাহাত্তর

জাতীয় স্মৃতিসৌধ

যে-সব মহান বীর সন্তানের আত্মত্যাগের ফলে অর্জিত হয়েছে স্বাধীন বাংলাদেশ, তাঁদের স্মরণে ঢাকার অদূরে সাভারে নির্মিত হয়েছে জাতীয় স্মৃতিসৌধ। দেশবাসী চিরকাল গভীর শ্রদ্ধার সাথে এঁদের স্মরণ করবে আর দেশকে সুন্দর করে গড়ে তোলার শপথ গ্রহণ করবে।

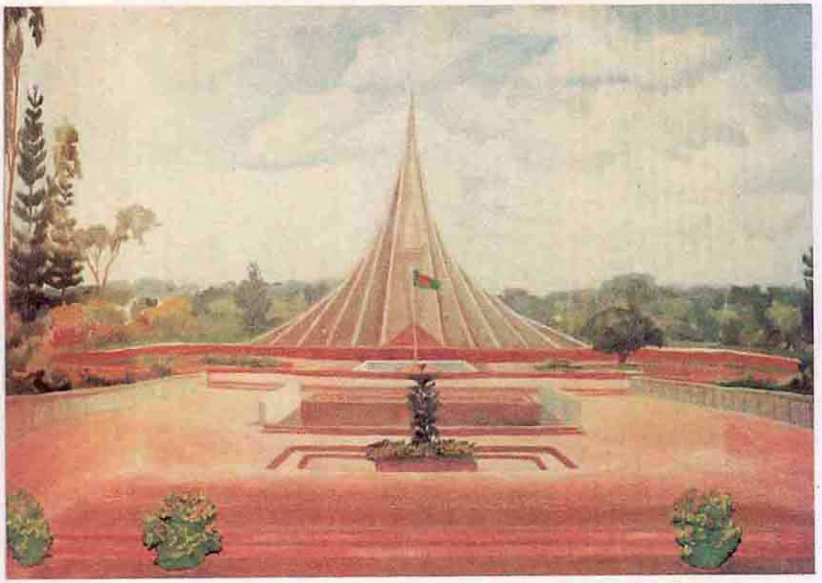

জাতীয় স্মৃতিসৌধ

শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ

মুজিবনগর স্মৃতিসৌধ

"এক সাগর রক্তের বিনিময়ে
বাংলার স্বাধীনতা আনলে যারা
আমরা তোমাদের ভুলবো না"

বাংলাদেশ যুগে যুগে

ISBN 984-09-0356-X

BCS , Bank

PDF বইয়ের অনলাইন লাইব্রেরী

MyMahbub.Com